কাকাবাবু সমগ্র

মহাকালের লিখন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

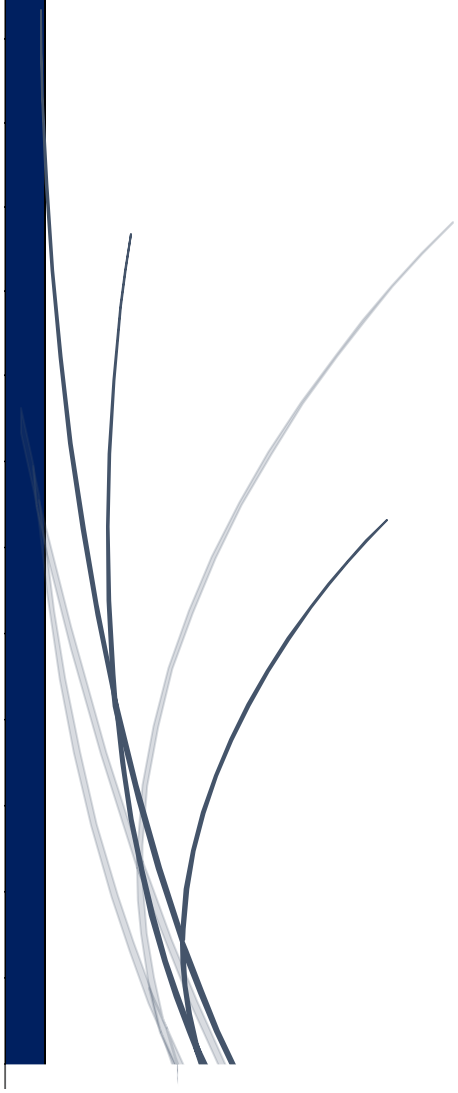

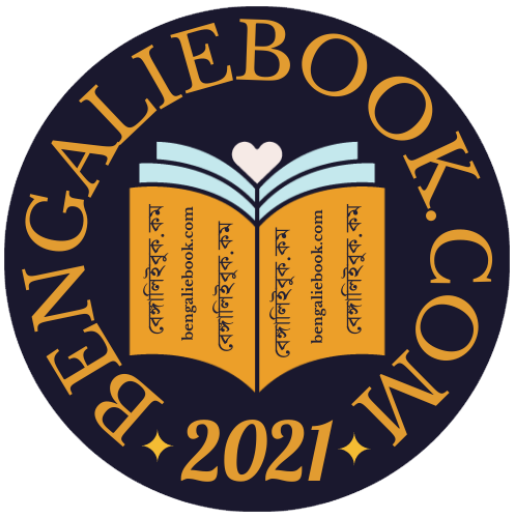

জয় বাবা কূর্ম অবতার

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, এ কী! এগুলো কিসের ডিম?

সন্তুও বেশ অবাক হয়েছিল। ডাক বাংলোর কুক তাদের দুজনের জন্য একটা প্লেটে চারটে ডিম-সেদ্ধ দিয়ে গেছে। ওরকম ডিম সন্তু কক্ষনো আগে দেখেনি। মুর্গির ডিমের চেয়েও একটু ছোট, পুরোপুরি গোল। ঠিক পিং পং বলের মতন। প্লেটে সাজানো যেন অবিকল চারটি বল, এক্ষুনি ওগুলো নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা যায়।

বিমান আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছে। সে শুধু এক কাপ চা নিয়ে বসেছে খানিকটা দূরে।

বিমান হাসতে হাসতে বলল। কাকাবাবু, আপনি চিনতে পারলেন না?

বাংলোর কুকটি বাঙালি। সে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, স্যার, এখানে হাঁসের ডিম তো পাওয়াই যায় না। মুর্গির ডিম চালান আসে, তাও মাঝে মাঝে কম পড়ে যায়। কিন্তু কচ্ছপের ডিম পাওয়া যায় যথেষ্ট।

কাকাবাবু বললেন, ছি ছি ছি ছি!

বিমান বলল, খেতে কিন্তু খারাপ নয়। আপনারা খেয়ে দেখুন। আমি বলছি, ভাল লাগবে।

কাকাবাবু বললেন,তুমি আমাকে কচ্ছপের ডিম চেনাচ্ছ? এক সময় কত কচ্ছপের ডিম খেয়েছি। কচ্ছপের মাংস খেয়েছি। এক-একটা কচ্ছপ মারলে তার পেটের মধ্যে চোদ্দ-পনেরোটা ডিমও পাওয়া যেত। এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও। আমরা খাব না।

বিমান বলল, এক সময় খেতেন, এখন খাবেন না কেন? আপনার আর সহ্য হয় না? তা হলে সন্তু খেয়ে নিক।

কাকাবাবু বললেন, না, সন্তুও খাবে না। তোমরা জানো না, কচ্ছপ মারা নিষেধ? সারা পৃথিবীতেই কচ্ছপের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পর কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। শুধু-শুধু এইভাবে কচ্ছপের ডিম নষ্ট করার কোনও মানে হয়?

বিমান বলল, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এগুলো তো সেদ্ধই হয়ে গেছে। এগুলো খেয়ে নিন। এগুলো থেকে তো আর বাচ্ছা বেরুবে না।

কাকাবাবু বললেন, তবুও খাওয়া উচিত নয়। তুমি যদি ভাবো, এই ডিমগুলো তো আমি নিয়ে আসিনি, আমি সেদ্ধও করিনি; সুতরাং আমার খেতে দোষ কী? তা হলে অন্য লোক আরও বেশি করে এই ডিম ধরবে, বাজারে এনে বিক্রি করবে। সেইজন্য একদম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। ডিম নিয়ে যাও, আমরা শুধু টোস্ট আর চা খাব।

বাংলোর কুকটি বললেন, আপনি বললেন, স্যার, কচ্ছপ কমে যাচ্ছে। এদিকে কিন্তু অনেক কচ্ছপ পাওয়া যায়। ওরা সমুদ্রে থাকে, কিন্তু ডিম পাড়বার সময় ওপরে উঠে আসে। মাটিতে সামান্য একটু গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে, তারপর আবার মাটি চাপা দিয়ে চলে যায়। লোকেরা সেই মাটি খোঁড়া দেখলেই চিনতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, লোকেরা অমনি সেই ডিমগুলো চুরি করে আনে, তাই তো। এখন যতই কচ্ছপ থাক, এইভাবে ডিম নষ্ট হলে একদিন কচ্ছপের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে না? পৃথিবীর কত প্রাণী এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বিমান বলল, কচ্ছপ মারাও যে খুব সোজা। একবার ধরে উল্টে দিতে পারলেই হল। ওরা নিজে থেকে সোজা হতে পারে না।

কাকাবাবু বললেন, নিরীহ প্রাণী বলেই এক সময় সাহেবরা হাজার-হাজার কচ্ছপ মেরে ফেলেছে। ভারত মহাসাগরে এমন অনেক দ্বীপ ছিল, সেখানে লক্ষলক্ষ কচ্ছপের বাসা ছিল। এক-একটা দ্বীপে যখন সাহেবদের জাহাজ নেমেছে, তখন খেলার ছলে তারা যত ইচ্ছে কচ্ছপ মেরেছে।

বিমান বলল, সাহেবরা তো সর্বভুক। কচ্ছপের মাংসও নিশ্চয়ই ওরা খায়।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, টারটল সুপ তো অনেকের প্রিয়। কিন্তু শুধু খাবার জন্য নয়। বললাম না, খেলার জন্যও মেরেছে? একদিনে কি হাজার-হাজার কচ্ছপ খাওয়া যায়? মজা করার জন্য জাহাজের খালাসীরা কচ্ছপগুলোকে ধরে ধরে উল্টে দিত। কে কটা পারে, তার প্রতিযোগিতা হত। তারপর ওরা জাহাজ নিয়ে চলে যেত। দিনের পর দিন হাজার-হাজার কচ্ছপ অসহায়ভাবে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত। দৃশ্যটা ভাবো তো। তারপর তারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যেত।

সন্তু বলল, ইস!

বিমান বলল, চলুন কাকাবাবু, এবার আমাদের বেরুতে হবে।

কাকাবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং রুম ছেড়ে সবাই চলে এল বাইরে। একটা ঝকঝকে নতুন জিপসি গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। উর্দিপরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

কাকাবাবু জোরে একবার শ্বাস টেনে বললেন, আঃ, এখানকার বাতাস কী পরিষ্কার! চমক্কার টাটকা গন্ধ! এইটুকু রাস্তা আর গাড়িতে গিয়ে কী করব। চলো হেঁটেই যাই।

বিমান বলল, হাঁটতে অসুবিধে হবে না আপনার?

কাকাবাবু হেসে বললেন, না হে, এই ক্রাচ নিয়েই আমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। চলো, চলো।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। একেবারে লেখার কালির মতন ঘন নীল জল। রয়াল রু। খুব কাছেই একটা দ্বীপ। সবুজ গাছপালায় এমন ভর্তি যে, এখান থেকে মনে হল, এক ইঞ্চিও জায়গা খালি নেই। এমন নিবিড় জঙ্গল সন্তু আর কোথাও দেখেনি।

সন্তু এই দ্বিতীয়বার এসেছে আন্দামানে। পোর্ট ব্লেয়ার শহরটা তার বেশ চেনা লাগছে। মনটা বেশ খুশি-খুশি লাগছে তার। এখানকার সমুদ্র অন্য রকম, দীঘা কিংবা পুরীর সঙ্গে কোনও মিল নেই। তীরের কাছে জল একটুও ঘোলা নয়, একেবারে স্বচ্ছ একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাছের ঝাঁক দেখা যায়।

মোটর লঞ্চটাও রেডি হয়ে আছে। ওপরের ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এর মালিক রূপেন মিত্র। কাকাবাবুদের দেখে দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন, আসুন মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা ঠিক নটার সময় স্টার্ট করব।

লঞ্চটা মাঝারি আকারের। নীচে চারখানা ক্যাবিন, অনায়াসে আটজন তোক। শুতে পারে। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও আছে। একসঙ্গে বেশ কয়েকদিন সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়ানো যায়। রূপেনবাবুদের ঝিনুক আর মাদার অফ পার্ল-এর ব্যবসা। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি সমুদ্রে ঝিনুকের অন্ত নেই। কত রকম ঝিনুক, মাঝে মাঝে শঙ্খও উঠে আসে। মাদার অফ পার্ল দিয়ে মেয়েদের গয়নার লকেট হয়।

এবার অবশ্য এই লঞ্চে ঝিনুক তুলতে যাওয়া হচ্ছে না।

বিমান একজন বিমান-চালক। তার নামের সঙ্গে কাজের খুব মিল। সে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের পাইলট, মাঝে মাঝেই তাকে আন্দামানে আসতে হয়। রূপেন মিত্তিরদের সঙ্গে তার খুব ভাব। বিমানই কাকাবাবুদের এখানে বেড়াতে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওপরের ডেকে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে, সবাই বসল সেখানে। লঞ্চটা বন্দর ছেড়ে ছুটে চলল গভীর সমুদ্রে। পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই অন্য লঞ্চ যাচ্ছে, সেগুলোতে যাত্রী ভর্তি। এখানে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলে লঞ্চ ছাড়া উপায় নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন্ দিকে যাব?

রূপেনবাবু বললেন, আমরা যাব রঙ্গত আয়ল্যান্ডের দিকে। পথে অবশ্য আরও অনেক দ্বীপ পড়বে।

বিমান বলল, এখানে কত যে দ্বীপ। অনেক দ্বীপের কোনও নামই নেই। কাকাবাবু, আপনি তো জানেন, আপনি এদিকটা ভাল করে ঘুরেছেন।

কাকাবাবু দুদিকে মাথা নাড়লেন।

বিমান আবার বলল, জানেন, রূপেনবাবু, একবার কাকাবাবু আর সন্তু একেবারে হিংস্র জারোয়াদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন।

রূপেনবাবু বললেন, তাই নাকি? যে দ্বীপটায় জারোয়া উপজাতি থাকে, আমরা তো সেটা এড়িয়ে চলি। কাছেই যাই না। আপনি গেলেন কী করে? ওরা আপনাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেনি?

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে এক লম্বা গল্প। এখন সে কথা থাক। আচ্ছা রূপেনবাবু, আপনি কি নিজের চোখে মারমেড দেখেছেন?

রূপেনবাবু বললেন, না, আমি দেখিনি। আমি লঞ্চে করে এখানকার সমুদ্রে অনেক ঘুরেছি। বড় বড় তিমি দেখেছি। হাঙরের ঝাঁক তো যখন-তখন দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লাইং ফিস দেখেছি। ডলফিনও দেখেছি। কিন্তু মারমেড জাতীয় কিছু কখনও আমার চোখে পড়েনি।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিমান যে বলল, আপনি দেখেছেন? মারমেড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো বিমান আমাদের এখানে টেনে আনল।

বিমান বলল, রূপেনবাবু নিজের চোখে দেখেছেন সে কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি যে, রূপেনবাবুর লোজনেরা দেখেছে।

রূপেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার লঞ্চের দুজন খালাসী নাকি দেখেছে। মাসখানেক ধরে এখানে একটা গুজব রটেছে যে, একটা মারমেড বা জলকন্যাকে নাকি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কোনও নির্জন দ্বীপের ধারে বালির ওপর সে বসে থাকে। মানুষের সামান্য সাড়াশব্দ পেলেই চোখের নিমেষে জলে ঝাঁপ দেয় তারপর গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। রঙ্গত আর মায়াবন্দরের বেশ কয়েকজন তোকই নাকি দেখতে পেয়েছে তাকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা বিশ্বাস করেন?

রূপেনবাবু বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। নিজের চোখে তো দেখিনি।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, যারা দেখেছে, তারা মারমেডটিকে কেমন দেখতে বলেছে?

রূপেনবাবু বললেন, ওপরের দিকটা একটা সুন্দরী মেয়ে, লম্বা চুল, ফর্সা রং, টানা-টানা চোখ। তার তলার দিকটা মাছের মতন। দুটো পা নেই, তার বদলে লেজ যেমন হয়।

কাকাবাবু বললেন, সবাই এই রকমই বলে। কোপেনহ্যাগেন শহরে এই রকম একটি মারমেডের মূর্তিও আছে।

বিমান বলল, সেটা তো বিখ্যাত। আমি দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মূর্তিটা তুমি দেখেছ। কিন্তু আসল মারমেড এ-পর্যন্ত কোনও মানুষ চোখে দেখেনি।

বিমান বলল, অ্যাঁ? কেউ দেখেনি? তবে যে বহুকাল ধরে এত গল্প।

কাকাবাবু বললেন, সবই গল্প। মানুষের কল্পনা। কোনও প্রমাণ নেই।

মাঝে মাঝে গুজব ওঠে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ছবি তুলতে পারেনি।

সন্তু বলল, আমি ক্যামেরা এনেছি। সত্যি যদি একটা মারমেড দেখতে পাই, তা হলে পটাপট ছবি তুলব। তা হলে সেটা একটা বিরাট আবিষ্কার হবে, তাই না?

কাকাবাবু বললেন, তা হবে। কিন্তু বেশি আশা করিস না। বেশি আশা করলে বেশি নিরাশ হতে হয়। সমুদ্রে ওরকম কোনও প্রাণী থাকতে পারে না।

বিমান অবিশ্বাসের সুরে বলল, থাকতে পারে না? এ কথা কী করে বললেন? সমুদ্রে এখনও কত রকম রহস্যময় প্রাণী আছে, মানুষ কি সব জানে?

কাকাবাবু বললেন, রহস্যময় প্রাণী থাকতে পারে। কিন্তু যে প্রাণীর ওপরের দিকটা মানুষের মতন, তার হার্ট আর লাংসও তো মানুষের মতন হবে। সে বেশিক্ষণ জলে ডুবে থাকবে কী করে? তবে অন্য দুটি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের দেখে অনেকে মানুষ বলে ভুল করে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, মানুষের মতন প্রাণী?

কাকাবাবু বললেন, মোটেই মানুষের মতন নয়। একেবারে জলজন্তু, একটির নাম মানাটি আর একটির নাম ডুগং। এরা বিরাট বিরাট প্রাণী। এক-একটির ওজন প্রায় এক টন। তিমি মাছ যেমন জলের ওপর মুখ ভাসিয়ে নিঃশ্বাস নেয়, তেমনি মানাটি আর ডুগংরাও প্রায়ই জলের ওপর মুখখানা ভাসিয়ে থাকে। বহুকাল ধরেই গভীর সমুদ্রে নাবিকরা এদের দেখেছে। এদের মুখের সঙ্গে মানুষের কিছুটা মিল আছে।

একটু থেমে অনেকখানি চওড়া করে হেসে কাকাবাবু আবার বললেন, মেয়েরা তো জাহাজের নাবিক হয় না। নাবিকরা সবাই পুরুষ। সেই জন্য মানুষের মুখের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে এমন প্রাণী দেখেই নাবিকরা তাকে কোনও মেয়ে বলে মনে করে। সেই থেকেই জলকন্যার কাহিনী চালু হয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, ঐ মানাটি আর ডুগংদের কেমন দেখতে?

কাকাবাবু বললেন, আমি নিজের চোখে দেখিনি, ছবি দেখেছি। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখে লিখেছেন যে, ওদের মুখ বিচ্ছিরি রাগী বুড়োর মতন। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে অনেকটা বড়। এদের তলার দিকটা মাছের মতন। কিন্তু এরা মাছ নয়। ম্যামাল। অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী, শিরদাঁড়া আছে।

বিমান বলল, দুর ছাই।

কাকাবাবু বললেন, আমি মারমেড দেখার আশা করিনি। তবে একটা মানাটি কিংবা ডুগং যদি দেখতে পাই, সেটাই যথেষ্ট। এদিককার সমুদ্রে সাধারণত ওদের দেখা পাওয়া যায় না।

রূপেনবাবু, বললেন, আমার খালাসী দুজন কিন্তু জোর দিয়ে বলেছে, ওরা একটা মেয়ের মতন প্রাণীকেই দেখেছে। আমাদের আজ ঠিক দেখাবে।

কাকাবাবু বললেন, ভাল কথা।

এরপর কফি এল। কফি খেতে খেতে ওরা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। নির্জন, সুন্দর সুন্দর দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে লঞ্চটা। মাঝে মাঝে বড় বড় ঢেউতে লাফিয়ে লাফিয়েও উঠছে। জল ছিটকে আসছে ওপরের ডেক। পর্যন্ত। কাকাবাবু, সন্তু, বিমান তিনজনই প্যান্ট শার্ট-পরা। কিন্তু রূপেনবাবু বনেদী বাঙালিদের মতন পরে আছে কুচোনো ধুতি। আর ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি। একবার জলের ছিটেয় তার পাঞ্জাবি অনেকটা ভিজে গেল।

কাকাবাবু একটা বায়নোকুলার এনেছেন। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্যরাও দেখছে।

এক সময় সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে—ঐ যে।

সবাই চমকে ঘুরে তাকাল।

না, জলকন্যাও নয়, মানাটি কিংবা ডুগংও নয়, এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ। ফ্লাইং ফিস। পার্শের মতন সাইজ দুপাশে ডানা, মাছগুলো জল থেকে লাফিয়ে উঠে ফর ফর ফর ফর করে বেশ খানিকটা উড়ে আবার জলে ডুব দিল।

কাকাবাবু বললেন, এও তো একটা বেশ ভাল জিনিস দেখলি রে সন্তু।

এর পর আরও তিন ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু দেখা গেল না।

সমুদ্র যতই সুন্দর হোক, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে একঘেয়ে লাগে। লঞ্চের ভট ভট ভট ভট শব্দটাও বিরক্তিক। যদিও বেশ হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। গরম না লাগলেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে যেন।

এক সময় লঞ্চটা হঠাৎ থেমে গেল।

রূপেনবাবু নীচের একটা ক্যাবিনে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবিটা পাল্টাতে। ওপরে এসে বললেন, আমার খালাসীরা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কাছেই ওই যে দ্বীপটা দেখছেন, ওর ধারেই নাকি দুবার দেখা গেছে মারমেডকে। এখানে অপেক্ষা করলে তার দেখা মিলতেও পারে। কিন্তু লঞ্চের শব্দ শুনলেই সে পালাবে। একটা নৌকো করে আমরা ওই দ্বীপটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি। দুপুরের খাবারেরও তো সময় হয়েছে। ওখানে গিয়েই আমরা খেয়ে নেব।

কাকাবাবু বললেন, চমৎকার আইডিয়া। জলকন্যা কিংবা টি কোনও জলজন্তু দেখা যাক বা না যাক নতুন একটা দ্বীপে পিকনিক তো হবে। সেটাই হোক।

বিমান সভয়ে বলল, এই দ্বীপে আবার জারোয়ারা থাকে না তো?

রূপেনবাবু বললেন, না না। দেখছ না। ছোট্ট দ্বীপ। চার পাশটাই তো দেখা যাচ্ছে। আন্দামানের জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক থাকে না। নির্ভয়ে ঘোরা যায়।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এই দ্বীপটার নাম কী?

রূপেনবাবু বললেন, তা তো জানি না। বোধ হয় কোনও নাম নেই।

এখানকার অনেক দ্বীপ শুধু নম্বর দিয়ে চেনানো হয়।

সন্তু বলল, আমি এই দ্বীপটার নাম দিলাম মারমেড আয়ল্যান্ড।

লঞ্চের গায়েই বাঁধা রয়েছে একটা ডিঙ্গি নৌকো। সেটা ভাসানো হল জলে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ছোট দ্বীপটায়।

দ্বীপটা একেবারে সুন্দর–আঁকা একটা ছবির মতন। তীরের কাছে মিহি, সাদা বালি ছড়ানো। তারপর নানান রঙের নুড়ি পাথর। তারপর গাছপালা। তবে এখানকার জঙ্গল খুব ঘন। বোধ হয় কখনও কখনও সমুদ্র ফুলে উঠে পুরো দ্বীপটাই ডুবিয়ে দেয়। ঘাস কিংবা ঝোপঝাড় কিছু নেই। বড় বড় গাছ আর মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা।

তীর থেকে খানিকটা ভেতরে চলে এসে সন্তু দেখতে পেল একটা গোল মতন পাথরের ঢিবি। জুতো খুলে সন্তু তর তর করে সেটার ওপরে উঠে গেল।

তারপর আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, এই জায়গাটায় সবাই মিলে বসলে খুব ভাল হয়। এখান থেকে সব দিকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

কাকাবাবু পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বেশ পেছল! আমি আর খোঁড়া পা নিয়ে ওপরে উঠব না।

বিমানও জুতো খুলে উঠে গেল ওপরে। ঢিবিটা একতলা সমান উঁচু। এখানে খুব বড় গাছ নেই বলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বিমান বলল, বাঃ, এরকম জায়গায় একটা বাড়ি বানাতে পারলে গ্র্যান্ড হত। বেশ নিজস্ব একটা দ্বীপ। তাতে একটাই বাড়ি থাকবে।

কাকাবাবু বললেন, আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে দ্বীপের চারপাশটা এবার ঘুরে আসি।

কাকাবাবু আড়ালে চলে যেতেই বিমান একটা সিগারেট ধরাল। কাকাবাবুর সামনে সে সিগারেট খায় না কক্ষনো।

ছোট নৌকোটা লঞ্চের দিকে ফিরে যাচ্ছে খাবার-দাবার আনতে। লঞ্চটা স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে, এখন ভাসতে ভাসতে এদিকেই যেন সরে আসছে।

সন্তু আর বিমান গল্প করছে, হঠাৎ চমকে উঠল দুজনেই।

পাথরটা একবার কেঁপে উঠল না? মাটি কাঁপছে?

ওরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোনও কথা বলবার আগেই আবার পাথরটা কেঁপে উঠল বেশ জোরে।

এবার বিমান চিৎকার করে উঠল ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

সন্তুও সড়াৎ করে পাথরটা থেকে গড়িয়ে নেমে চেঁচিয়ে বলল, কাকাবাবু, সাবধান! ভূমিকম্প হচ্ছে।

সন্তুর ধারণা হল ভূমিকম্পে দ্বীপটার মাঝখানটা ফেটে দুভাগ হয়ে যাবে, তারপর সব সুষ্ঠু ডুবে যাবে সমুদ্রে।

কাকাবাবু জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পিছিয়ে এলেন খানিকটা। সন্তু আর বিমান দুজনেই চ্যাঁচাচ্ছে। তিনি ওদের কাছে এসে বললেন, কী হয়েছে? কোথায় ভূমিকম্প? আমি তো কিছু টের পেলাম না।

রূপেনবাবু এসে বললেন, আমিও তো বুঝতে পারিনি।

বিমান বলল, পাথরটা দুবার জোরে জোরে কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে সন্তু চোখ বড় বড় করে সাঙ্ঘাতিক বিস্ময়ে বলল, একী! একী!

ওদের চোখের সামনে পাথরের ঢিবিটা দুলতে শুরু করেছে। আর একটু একটু এগোচ্ছে। ঠিক জীবন্ত কোনও প্রাণীর মতন।

ভয় পেয়ে সবাই ছিটকে দূরে সরে গেল।

বিমান বলল, ওরে বাপ রে, এটা কোন বিরাট জন্তু?

রূপেনবাবু এক দৌড় মেরে জলের ধারে গিয়ে তার খালাসীদের ডেকে বলতে লাগলেন, ওরে রঘু, ওহে রতন, মানসিং, শিগগির লঞ্চটা নিয়ে এসো। প্রকাণ্ড জানোয়ার। মেরে ফেলবে। মেরে ফেলবে।

পাথরের ঢিবির মতন প্রাণীটা কিন্তু একটু-একটু নড়তে লাগল শুধু। ওদের দিকে তেড়ে এল না।

কাকাবাবু সাহস করে একটু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ দিয়ে পাথরটার গায়ে একটু ঘষে দিলেন। সেটার ওপরে শ্যাওলা জমে আছে। একটুখানি খসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, এটা তো মনে হচ্ছে একটা কচ্ছপ।

বিমান বলল, অ্যাঁ? এত বড় কচ্ছপ? তা কখনও হতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও দেখি, কচ্ছপ হলে নিশ্চয়ই একটা মুখ থাকবে। মুখটা দেখলেই বোঝা যাবে।

কাকাবাবু প্রাণীটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন। বেশি খুঁজতে হল না। একটা গাছের আড়াল থেকে ঝটাং করে বেরিয়ে এল তার গলা আর মুখ। হাতির গুঁড়ের মতন মোটা। ক্রিকেট বলের সাইজের দুটো চোখ যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

কাকাবাবু তবু ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, মুখটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—এটা কচ্ছপ। সমুদ্রে অনেক বড় বড় কচ্ছপ থাকে বটে, কিন্তু এত বড় কচ্ছপ যে হতে পারে। তা কখনও শুনিনি।

সন্তু বলল, কাকাবাবু আর এগিয়ো না।

কাকাবাবু বললেন, কচ্ছপ যখন, তখন ভয়ের কিছু নেই। এরা নিরীহ প্রাণী, মানুষকে তেড়ে এসে কামড়ায় না।

এর মধ্যে রূপেনবাবুর চ্যাঁচামেচি শুনে লঞ্চটা হুইশল দিতে দিতে চলে এল এদিকে। লাঠি, লোহার রড নিয়ে নেমে এল ছসাত জন খালাসী। হৈ-হৈ করে কাছে এসে বলল, কোন্ জানোয়ার? কোথায়? কোথায়?

এত বড় একটা কচ্ছপ দেখে তাদেরও চক্ষু ছানাবড়া। একজন বলল, একটা পাহাড়ের মতন কচ্ছপ? স্বপ্ন দেখছি না তো?

আর একজন বলল, এটাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

রূপেনবাবুও এখন খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি এবার খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাকে পোর্টব্লেয়ার নিয়ে যাব। তারপর কলকাতায় নিয়ে যা এরকম কচ্ছপ কেউ কখনও দেখেনি। তারপর বিলেত আমেরিকায় পাঠাব। এটাকে উল্টে দাও। উল্টে পাগুলো বাঁধো।

কিন্তু এত বিরাট কচ্ছপকে উল্টে দেওয়া সহজ নাকি? কচ্ছপটা তার মুণ্ডুটা এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছে।

একজন বলল, সাবধান! কচ্ছপের মুখের কাছে গেলে কামড়ে দেবে। হাত কিংবা পা কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না। ওর মুখটাকে আগে আটকাতে হবে।

একজন একটা লোহার রড বাড়িয়ে দিল কচ্ছপটার মুখের কাছে। কচ্ছপটা সেটা সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরে দুটো ঝটকা মারতেই রডটা ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল।

রূপেনবাবু দূর থেকেই এক লাফ দিয়ে বললেন, বাপরে! দাঁতের কী জোর!

রঘু নামের একজন খালাসী বলল, স্যার, আমি কচ্ছপ ধরার কায়দা জানি। একটা শক্ত নাইলনের দড়ি চাই।

একজন দড়ি আনতে ছুটে গেল। অন্য সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত বড় চেহারা নিয়েও কচ্ছপটা বোধ হয় বেশ ভীতু প্রাণী। সে দৌড়ে পালাবারও চেষ্টা করল না, কারুকে তেড়ে কামড়াতেও এল না।

রঘু নাইলনের দড়িটা পেয়ে একটা ফাঁস তৈরি করল। তারপর সেটা ছুড়ে দিল কচ্ছপটার মুখের দিকে। দুতিনবারের চেষ্টায় ফাঁসটা জড়িয়ে গেল তার গলায়। দুজন খালাসী দুদিক থেকে টান মারতেই সেটা আঁট হয়ে গেল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ দুটো দিয়ে।

সন্তু বলল, কচ্ছপটা বোধ হয় খুব বুড়ো।

কাকাবাবু বললেন, শুনেছি, ওরা বহু দিন বাঁচে। এর বয়েস কয়েক শো বছর হলেও আশ্চর্য কিছু নেই।

রঘু বলল, এবার সবাই মিলে হাত লাগিয়ে ওকে উল্টে দিতে হবে।

সবাই কাছে এসে হাত লাগাবার আগেই কচ্ছপটার পিঠটা কেঁপে উঠল কয়েকবার। ওর পিঠে কিছু কিছু মাটির চাপড়া ছিল তা খসে গেল। তখন দেখা গেল তার পিঠে অনেক হিজিবিজি দাগ।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, দেখুন, দেখুন এই দাগগুলো। মনে হচ্ছে, এক জায়গায় বাংলা অ লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, ঘরের দেয়ালে জল পড়ে নোনা ধরলেও অনেক সময় এরকম মনে হয়। অ নয় রে আ, পাশের দাগটা ঠিক আকারের মতন।

বিমান রূপেনবাবুরাও ঝুঁকে এসেছেন দেখতে। বিমান বলল, তার পাশেই তো র। কেউ যেন লিখেছে আর।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে কচ্ছপটার পিঠটা খুব ভাল করে ঘষলেন। অনেক ময়লা সরে গেল। এবার ফুটে উঠল আরও অক্ষর। আর, এর একটু পরেই মা।

সন্তু বলল, তারপর এটা কী? এ? মা এ?

কাকাবাবু বললেন, এ নয় তয়ে র-ফলা। মাত্র—তা হলে হল আর মাত্র। রূপেনবাবু বললেন, আশ্চর্য! আশ্চর্য! কচ্ছপের পিঠে এরকম লিখল কে?

কাকাবাবু গভীর বিস্ময়ে কচ্ছপের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর অভিভূতভাবে বললেন, প্রকৃতি লিখে দিয়েছে। কিংবা মহাকালও বলতে পারেন। প্রবাদ আছে, মহাকুর্ম অর্থাৎ বড় কোনও কচ্ছপের পিঠে মহাকাল তার ইতিহাস লিখে রাখে।

সন্তু বলল, আরও কিছু লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, আমি সবটা পড়তে পারছি। এই দ্যাখ ভাল করে। আর মাত্র দুটি। মেরো না, মেরো না, মেরো না।

সন্তু বললেন, হ্যাঁ, স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রকৃতি লিখে দিয়েছে যে, পৃথিবীতে এরকম কচ্ছপ মাত্র দুটো বেঁচে আছে।

বিমান বলল, কী বলছিস প্রকৃতি কিংবা মহাকাল বাংলায় লিখবে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, মহাকাল কখন কোন্ ভাষায় লেখেন, তার তুমি আমি কী জানি। কথাগুলো যে লেখা রয়েছে, তা তো সত্যি। কচ্ছপটা নিজেই পিঠ ঝাঁকিয়ে তা আমাদের দেখাল।

তারপর হঠাৎ কাকাবাবু হাত জোড় করে আবেগের সঙ্গে খালাসীদের বললেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, ওকে ছেড়ে দিন। বন্দী অবস্থায় যদি ও মরে যায়, তা হলে পৃথিবী থেকে এই কচ্ছপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এদের ধ্বংস করার কোনও অধিকার আমাদের নেই।

খালাসীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রূপেনবাবু বললেন, ওরে বাপ রে, বাপ। জন্মে কখনও এমন দেখিনি। ভগবান নিজে লিখে দিয়েছেন, ওকে মেরো না। ওকে বন্দী করলে আমাদের মহাপাপ হবে। ইনি সাক্ষাৎ কুর্ম অবতার। ওরে ছেড়ে দে ছেড়ে দে, শিগগির ছেড়ে দে।

খালাসীরা এবার ফাঁস খুলে নিল ওর গলা থেকে। কাকাবাবু সবাইকে দূরে সরে যেতে বললেন। সকলে সার বেঁধে কচ্ছপটার পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

কচ্ছপ এবার থপ থপ করে এগোতে লাগল জলের দিকে।

রূপেনবাবু হাত জোড় করে বললেন, জয় বাবা কূর্ম অবতার। আমাদের দোষ নিও না।

তাঁর দেখাদেখি অন্য খালাসীরাও নমস্কার করলেন।

কচ্ছপটা জলের কাছাকাছি গিয়ে একবার মুখটা ফিরিয়ে ওদের দেখল। তারপর প্রবল আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেল নীল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে।